তারিখ ... 21 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

# কর্মসংস্থানের সংকট ও কারিগরি শিক্ষা

উন্নয়ন | কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

অর্থনীতিবিদ

আমরা জানি, একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির জন্য এ দেশের ছাত্রসমাজ পাকিস্তান আমলে অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। সেটা মনে রেখে বঙ্গবন্ধু কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আমরা দেখি, বঙ্গবন্ধু শাসনভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই গঠিত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে এই ধারার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তবে বঙ্গবন্ধু যে কেবল একটি সদ্য স্বাধীন, জনবহুল দেশে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এমন চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন, সেটা বলা যাবে না। কারণ, আমরা দেখি তিনি সেই পঞ্চাশের দশকে প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। সেই ১৯৫৬ সালে তিনি বলছেন– 'দেশের প্রাপ্তব্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং ইহাকে জনগণের কাজে লাগানই হইতেছে দেশকে শিল্পায়িতকরণের উদ্দেশ্য। কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ও ইহাকে সর্বস্তরে বহুমুখীকরণই ইহার যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য পরিপূরক।' (দৈনিক আজাদ, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৬)

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৯ মে রাজশাহীর জনসভায় বলছেন– 'আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক।' শিল্পায়ন ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'গ্রামে গ্রামে সব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।'

আমরা জানি, শেখ হাসিনা সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। এতে বঙ্গবন্ধুর সেই চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক কাজ শুরু করেছিল। প্রতিটি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের অংশ হিসেবে ১৮টি নতুন পলিটেকনিক স্থাপন, ২০টি পুরাতন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ, দেশের ৬৪টি ভকেশনাল ইনস্টিটিউটকে টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে রূপান্তর, প্রায় আড়াই হাজার নতুন জনবল নিয়োগদান, পলিটেকনিক ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে স্থায়ীভাবে দ্বিতীয় শিফট চালুকরণ এগুলোর অন্যতম। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দফায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ হাসিনা সরকার একটি যুগোপযোগী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার সুযোগ হয়েছিল 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ সংসদে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত হয়। বাস্তবতার আলোকেই সঙ্গত বিভিন্ন আঙ্গিকে শিক্ষানীতি ২০১০-এ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয় এবং পরবর্তীকালে প্রণীত অন্যান্য শিক্ষা কমিশন বা কমিটির প্রতিবেদনগুলো থেকে প্রাপ্ত ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করা হয়।

২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর সঙ্গতভাবেই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়– 'দক্ষ জনশক্তি আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।' এতে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন চিন্তা এবং তা বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণার প্রতিফলন ঘটেছিল।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষানীতি ২০১০-এ যেসব কৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– প্রথমত, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং



> বর্তমান অবস্থায় কৃষিনির্ভর এবং কৃষি-সহায়ক শিল্প কারখানা ও অন্যান্য শ্রমঘন শিল্প কারখানা তৈরিতে জোর দিতে হবে। এর জন্য দক্ষ কর্মকুশল জনশক্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। উন্নত কৃষির (ফসল, মাছ চাষ, পশু পালন) জন্যও দক্ষ জনশক্তি লাগবে। আধুনিক শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি চালনায় যেমনি প্রয়োজন হবে অধিকতর প্রায়োগিক দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকুশল কারিগর, তেমনি প্রয়োজন হবে অধিকতর তাত্ত্বিক ও যোগাযোগ দক্ষতার অধিকারী কর্মীর

ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সব ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে। তৃতীয়ত, অষ্টম শ্রেণী সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূলধারায় পড়বে না তারা ছয় মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান-১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। তারপর যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ অর্জন করার এবং পরে [illegible]

করা হবে। মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। যেসব দেশে আমাদের দেশের মানুষ কাজ করতে যায় সেসব দেশের শ্রমবাজার বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং ওই সব দেশের ভাষার ন্যূনতম জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

স্বীকার করতে হবে, সরকার এসব নির্ধারিত করণীয় যথাসম্ভব কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অবশ্য সবকিছু রাতারাতি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তবে আর্থিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাকি পথ কার্যকরভাবে অতিক্রম করতে হলে বাস্তবায়ন দক্ষতার উন্নতি এবং বাস্তবায়নে সততা ও দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা দেখছি, সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় এনরোলমেন্ট শতকরা ২০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে এই শিক্ষা গ্রহণ করে তারা দেশ-বিদেশে চাকরি পেতে পারে, নিজ উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করতে পারে। এজন্য যারা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত তাদেরকে আরও বেশি করে যত্নবান হতে হবে, যাতে

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মান নির্ধারণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছে; কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন কোর্স, সিলেবাস ও কারিকুলাম শিল্প কারখানার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্তে বিভিন্ন শিল্প কারখানার প্রতিনিধিদের নিয়ে পেশা অনুযায়ী ১২টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কিল কমিটি (আইএসসি) গঠন করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে বর্তমান সরকার। যেমন বরিশাল, ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে। একটি টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও অঙ্গীকার রয়েছে। এছাড়াও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে আরও যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে– যেসব জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই এমন ২৩টি জেলায় নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরি করা; ৭টি বিভাগে ৭টি মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা; গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন এবং নতুন দুটি টেকনোলজি সংযোজন করা; সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগীয় সদরে তিনটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা; জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে দেশের সব উপজেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠানকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা, ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে চারটি ল্যান্ড কলেজ স্থাপন করা ইত্যাদি।

বস্তুত বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব পরিমণ্ডলে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর এ ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যে জাতি শিক্ষায় অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যত শিক্ষিত ও দক্ষ সেই জাতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তো বটেই, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তত উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পারে।

একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং অপরদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের তাগিদ থাকায় বাংলাদেশকে শুধু কৃষিনির্ভর থাকলে চলবে না। আবার কৃষি জমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে ভূমির অন্যান্য ব্যবহার ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের ভেতরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং নদীভাঙনসহ বিভিন্ন কারণে। অবশ্যই কৃষির টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে অধিকতর হারে শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান অবস্থায় কৃষিনির্ভর এবং কৃষি-সহায়ক শিল্প কারখানা ও অন্যান্য শ্রমঘন শিল্প কারখানা তৈরিতে জোর দিতে হবে। এর জন্য দক্ষ কর্মকুশল জনশক্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন। উন্নত কৃষির (ফসল, মাছ চাষ, পশু পালন) জন্যও দক্ষ জনশক্তি লাগবে। আধুনিক শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি চালনায় যেমনি প্রয়োজন হবে অধিকতর প্রায়োগিক দক্ষতা সম্পন্ন কর্মকুশল কারিগর, তেমনি প্রয়োজন হবে অধিকতর তাত্ত্বিক ও যোগাযোগ দক্ষতার অধিকারী কর্মীর। মানুষের এগিয়ে চলার জন্য স্বাস্থ্যসেবাও